ডাকাতের গ্রাম ‘ট্যাঙ্গার মাঠ’ এখন প্রবাসী গ্রাম

অভিশপ্ত একটি গ্রামের নাম ছিল মেহেরপুরের ‘ট্যাঙ্গার মাঠ’। মেহেরপুর জেলা শহর থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দুর কুতুবপুর ইউনিয়নের একটি গ্রাম ট্যাঙ্গার মাঠ। গ্রামটির বর্তমান মসজিদের মোয়াজ্জিন ও খন্ডকালিন ইমাম হাজী আকবার আলীও ছিলেন এক সময়কার শীর্ষ ডাকাত। আর এই শীর্ষ ডাকাতের হাত ধরেই এই গ্রামের কয়েক শত লোক জড়িয়ে পড়ে চুরি ডাকাতি, ছিনতাইসহ নানা ধরনের অপরাধ জগতে।

সেই ডাকাত আকবার আলীই আজকের হাজী আকবার আলী। বর্তমানে তিনি কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক ও ট্যাঙ্গার মাঠ গ্রাম আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি। সেই সাথে তিনি স্থানীয় গ্রামের জামে মসজিদের মোয়াজ্জিনের দায়ীত্ব পালন করছেন। চোরের গ্রাম থেকে সেই গ্রামটি এখন প্রবাস গ্রাম হিসেবে পরিচিতি। গ্রামে লেগেছে উন্নয়নের ছোঁয়া।

অপরাধীর গ্রাম হিসেবে পরিচিত গ্রামের নামটিও পরিবর্তন করে এখন হয়েছে শিশিরপাড়া। মানুষকে কেউ এখন আর চোর, ডাকাত বা অপরাধী বলে গালি দেইনা। এই গ্রামের ঘরে ঘরে এখন ও সুখ ও শান্তির সুবাতাস। ছোটরা এখন চুরি বিদ্যা নয়, সবাই শিখছে লেখা পড়া। স্কুল কলেজ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এখন লেখা পড়া করছেন চোরের গ্রাম নামে খ্যাত সেই ট্যাংগার মাঠ গ্রামের ছেলে মেয়েরা।

কৃষক হজরত আলী, জাহিদুল ইসলাম ও রেবেকা খাতুন জানালেন, এক সময়কার আলোচিত ট্যাংগার মাঠ গ্রামের মানুষ অপরাধ জগত থেকে বেরিয়ে এসেছেন। কেউ এখন ওদের নামের শেষে চোর কিংবা ডাকাত বলে না। এলাকায় বা আশে-পাশের গামে ডাকাতি কিংবা চুরি হলেও কেউ এখন আর খোঁজ করতে ট্যাঙ্গার মাঠে আসেনা। মানুষ সবাই এখন কর্ম ব্যস্ত। কেউ ব্যবসায়ি কিংবা কেউ দিন মজুর।

এ গ্রামের গ্রামের প্রায় এক হাজার লোক সৌদী, ওমান, বাহারাইন, মালেশিয়া, সিঙ্গাপুর, মালদীপমহ বিভিন্ন দেশে আছেন। তারা প্রতি মাসেই মোটা অংকের টাকা পাঠাচ্ছেন পরিবারের জন্য। প্রতিটি পরিবারেই এখন স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করছেন। প্রতিটি পরিবারের সদস্যই এখন প্রবাসী। এক সময়ের চোরের গ্রাম এখন প্রবাস গ্রাম

হিসেবে চেনে আশেপাশের জেলাবাসি।

কলেজ ছাত্র লিজন শাহ, স্কুল ছাত্র রাসেল আহম্মেদ, শাহ আলম জানান, এই গ্রামের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ৪৫ জন শিক্ষার্থী লেখা পড়া করছে। এছাড়া পাশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৬ জন কলেজে ৮ জন ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ জন ছাত্র পড়া লেখা করছেন। প্রতিটি পিতা মাতাই এখনই তাদের ছেলে মেয়েদের পড়া লেখার ব্যাপারে সোচ্ছার। লেখা পড়ার জন্য এখন অনেকেই শহরে গিয়ে অবস্থান নিয়েছেন বলে জানান তারা।

কথা হলো ট্যাঙ্গার মাঠ গ্রামের সেই শীর্ষ ডাকাত বর্তমান মোয়াজ্জিন আকবর আলীর সাথে। তিনি জানালেন, আমাদের বাড়ি ছিলো ভারতের করিমপুর থানার রহমতপুর গ্রামে। হিন্দুদের অত্যচারে ১৯৪৭ সালে আমরা স¦পরিবারে বাংলাদেশে এসে গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তি কাজিপুর গ্রামে আশ্রয় নিই। সেখানেও আমাদের উপর অত্যাচার শুরু করে একটি গেষ্ঠি। পরে সেখান থেকে সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামে চলে আসি।

এসময় এই এলাকার তৎকালিন হিন্দু জমিদার রাজলক্ষি গংদের কাছ থেকে মেহেরপুর থানাপাড়ার আনোয়ার হোসেন ও হজরত আলী ৭০০ বিঘা জমি বিনিময় সূত্রে তাদের কাছ থেকে নেন। ১৯৬৮ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারা বিনিময় সূত্রে নিলেও শ্যামপুর, বেলতলাপাড়া, ঝাউবাড়িসহ আশেপাশের লোকজন তাদের সেই জমি দখল দেইনা। পরে নজরুল ইসলাম আমাদের ৫০ জন লোককে ৫০ বিঘা জমি লিখে দেওয়ার শর্তে প্রথমে এই ট্যাঙ্গার মাঠ গ্রামে বসতি গড়ার প্রস্তাব দেন।

১৯৮০ সালের গোড়ার দিকে গ্রামটিতে আমি জুলমত হোসেন, আলী হোসেন, তাহের আলী, আসমত আলী, আমির, আকবর আলী, মজিব আলী, এলকাত হোসেনসহ ৩০ টি পরিবার বসবাস শুরু করে গ্রাম গড়ে তুলি। ওই সময় ভারত থেকে গরু চুরি করে আনতাম। পরে এক সময় এলাকার লোকজনের গরু চুরি করতো। পরে সব অপরাধ কর্মকান্ড পরিচালিত হতো এই গ্রাম থেকে।

তিনি বলেন, সীমান্তের ওপারে ভারতে অপরাধ করতে যেয়ে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ওই গ্রামের ১৫ জন ডাকাতের প্রাণ গেছে গণপিটুনিতে। এদের মধ্যে রয়েছেন আবু ডাকাত, আসমত ডাকাত, পঁচা ডাকাত, ছলিম ডাকাত, আবুজেহেল ডাকাত, ফড়িং ডাকাত। ১৯৮৮ সালে তৎকালীণ মেহেরপুরের পুলিশ সুপার গিয়াস উদ্দীন ও জেলা প্রশাসক মহিউদ্দিন এই গ্রামের ডাকাত সর্দার আকবর আলী ও তার ডাকাত দলের সাথে বৈঠক করেন। সব ধরনের সহযোগীতা ও মামলা থেকে রেহায় দেওয়ার আশ্বাস দিলে অপরাধ জগত থেকে

ফিরে আসার ঘোষণা দেন অপরাধীরা। প্রাশাসনের সহযোগিতায় অপরাধ জগত থেকে ফিরে আসার শপথ নেন। সে সময় জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার তাদের প্রত্যেক পরিবারকে ১ মন করে চাল দিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

গ্রামের লোকজন পুকুর খনন ও মাছ চাষের পাশাপাশি যুবকদের বিদেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমে গ্রামের ডাকাত সর্দার আকবর আলীকে সৌদী আরবে পাঠান। এরপর প্রতিটি বাড়ির লোকজনের সমন্বিত উদ্যোগে প্রতিবছর এক জন করে বিদেশে পাঠাতে শুরু করেন। এখন গ্রামের অনেকেই বিভিন্ন দেশে কর্মরত আছে। এখন আর তাদের কোন অভাব নেই তারা এখন সবাই সাবলম্বি।

ট্যাঙ্গার মাঠ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্য্যালয়ের প্রাধান শিক্ষক আবেদ আলী জানান, বছর দশেক আগেও এ গ্রামের লোকজন তাদের ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে চাইতো না। কিন্তু এখন এ গ্রামের সকল ছেলে মেয়েই স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া লেখা করছে। এখন গ্রামের কেউ অপরাধ জগতের সাথে জড়িত নন। সকলেই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে।

গ্রামের গৃহবধু, রমেছা খাতুন, নেকজান নেছা, আলেয়া বেগম, আব্দুল হামিদ, সাবু ডাকাত, জানান সহ বেশ কয়েকজন জানান, অভাবের তাড়নায় গ্রামের লোকজন নানা অপরাধে জড়িত ছিল। সে সময় আশ পাশ এলাকার লোকজন এখানকার লোকজনকে ঘৃণা করতো। কেউ আত্মীয়তা করতে চায়তো না। এখন এ গ্রামের লোকজন কোন অপরাধে জড়িত নয়। সবাই স্বাবলম্বী। কেউ আর এ গ্রামের লোকজনকে ঘৃণা করে না।

অপরাধ বিশ্লেষক ও মেহেরপুর জেলা কন্যা শিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম বলেছেন, মানুষ কেউ অপরাধী হয়ে জন্ম নেয়না। পরিবেশ পরিস্থিতি তাকে অপরাধী হিসেবে সৃষ্টি করে। আমাদের সবার উচিৎ কেউ অপরাধী হয়ে উঠলে তাকে পারিবারিক, সামাজিকভাবে সহযোগীতা করে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনা।

কুতুবপুর ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ডের সদস্য (মেম্বর) আনিছুর রহমান বলেন, ওয়ার্ডটিতে প্রায় সাড়ে ৫ হাজার মানুষের বসবাস। এদের মধ্যে মোট ভোটার সংখ্যা ৩৪২৫ জন। অর্ধেকের বেশী নারী ও বাকীরা পুরুষ ভোটার। গ্রামের প্রায় ১২ শ মানুষ বিভিন্ন দেশে রয়েছেন। বাকীরা কৃষক, রাজমিস্ত্রি, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও অন্যান্য পেশার সাথে জড়িত রয়েছেন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের গাংনী এরিয়া অফিসের সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দীন বলেছেন, পারিপার্শিক সহযোগীতা পেলে সকলেই আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে উঠতে পারে। তার উজ্জল দৃষ্টান্ত মেহেরপুরের এই টেঙ্গার মাঠের বাসিন্দারা। এক সময়ে যে গ্রামের লোকজন চুরি ডাকাতি রাহাজানিসহ নানা ধরনের অপরাধের সাথে জড়িত ছিল। তারাই আজকে সমাজে শান্তি শৃংখলার সাথে বসবাস করছেন।